অধরা চাঁদের জোছনা

এল আর বিশ্বাস

অধরা চাঁদের জোছনা

এল আর বিশ্বাস

জলছবি প্রকাশন

অধরা চাঁদের জোছনা

এল আর বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪

ISBN : 978-984-93262-9-8

প্রচ্ছদ
নবী হোসেন

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন ঃ ১৬২৯৭

....

Odhora Chander Josna, writen by **L R Biswas**
Published in Ekushey Boimela-2019, by AKM Nasiruddin Ahmed,
Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000. **Pricet Taka 200.00**

উৎসর্গ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সকল সদস্যদের উদ্দেশে–যাদের ভালোবাসা এবং সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত আমি।

ভূমিকা

সমাজ সংসারে একটি স্বঘোষিত উপদেশ আছে, আমি যা করি তা নয়, বরং আমি যা বলি তাই করো। নিজের সন্তানদেরকে তো বটেই, এমনকি অন্যদেরও একই উপদেশে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

আসফাক চৌধুরি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। অর্থ-বিত্ত-সম্মান-যশ অর্জনের পেছনে ছিল তার কঠোর পরিশ্রম। যৌবনে প্রেমের শরে বিদ্ধ করেছেন অন্যধর্মের এক তরুণী কেয়া চক্রবর্তীকে। ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের কারণে কেয়া চক্রবর্তীর পরিবার পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে দেশত্যাগ করে। কিন্তু তারই সন্তান আশরাফ যখন তাদের চেয়ে নিম্ন অর্থ-বিত্ত সম্পন্ন পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে সাবিনাকে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে চায়, তখন প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ার বাবা আসফাক চৌধুরি। অপরদিকে সাবিনার কেরানি বাবার ধারণা বিত্তশালীরা মানুষকে ভালোবাসে না, শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করে। আশরাফ-সাবিনা নিজেদের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দিয়ে ঘর বাঁধলে দুই পরিবারের দুই পিতা তা মেনে নেয়নি। সাবিনা পিতৃগৃহ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যে তার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে আত্মীয়-প্রতিবেশী সবাই বাবার মৃত্যুর জন্য তাকেই দায়ী করতে থাকে। বিশ্বস্ত বন্ধু রহমান আশরাফ-সাবিনাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে। বছরান্তে সাবিনা তার সন্তান বাবুল আশরাফ চৌধুরিকে আতুর ঘরে রেখেই মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যু আশরাফ সহজে মেনে নিতে না পারায় ধীরে ধীরে তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে এবং এক সময় মানসিক হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

শিশু বাবুল আশরাফ চৌধুরি খালা সাহিনা বেগমের যত্নে বড় হয়ে ওঠে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়। প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে পরিচয় হয় অত্যন্ত বিত্তশালীর এক মেয়ে কণিকার সাথে। বাবু স্কলারশিপ নিয়ে নরওয়ের বারগেন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। কনিকার বাবা মেয়ের অমতে তার চেয়েও বিত্তশালী মুছাব্বির সাহেবের আমেরিকা প্রবাসী উশৃংখল ছেলে মুন্তাসিরের সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে আকদ্ করিয়ে আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কণিকা সব ঘটনা বাবুকে জানায়। একদিন কণিকাকে ঢাকা-দুবাই-নিউইয়র্ক যাবার জন্য এমিরেটস্-এর একটি প্লেনে তুলে দেয়। কিন্তু কণিকা বাবুর সাথে পূর্ব পরিকল্পনা মতো দুবাই থেকে প্লেন চেইঞ্জ করার সময় নিউইয়র্কগামী প্লেনে না চড়ে নরওয়ের রাজধানি অসলোগামী প্লেনে চড়ে।

ধর্ম ও বিত্তের পার্থক্যের কারণে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে তার নানাবিধ প্রভাব, পিতা-মাতার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নেতিবাচক প্রভাব, ন্যায়, সততা, সহযোগিতা এবং নিখাঁদ ভালোবাসার বিজয় মানুষকে স্বমহিমা ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত করে। জগতে মানুষই আসল সম্পদ এবং সম্পত্তি। আর ভালোবাসা তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চালিকাশক্তি। 'অধরা চাঁদের জোছনা' উপন্যাসটিতে এই বিষয়গুলো নিখুঁভাবে উঠে এসেছে।

এল আর বিশ্বাস
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

এক

বাবুল আশরাফ চৌধুরী। ডাক নাম 'বাবু'। নরওয়ে বারগেন ইউনিভার্সিটি থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টারস্ করে সেখানেই গবেষণা ফেলো হিসেবে যোগ দিয়েছেন। আসলে বাবু পাস করে বেরোবার আগেই ইউনিভার্সিটি অগ্রিম এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেখেছিল। কেননা, এত ভালো আর মেধাবি ছাত্র দু'দশ বছরে আর একটিও পাওয়া যায়নি। চাকরি ভালো, বেতন ভালো। এতদিনের পরিশ্রম আর কষ্ট সার্থক হয়েছে।

একবার ভেবেছিল দেশে ফিরে গিয়ে সেখানেই কাজ করবে। অনেক ভেবেচিন্তে আবার সেই চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে। লোকে বলবে দেশের ছেলে দেশে ফিরে আসবে না, এ আবার কেমন কথা। নটরডেম-এর প্রিন্সিপাল স্যারসহ অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন, 'তুমি এত ভালো ছাত্র, ফিরে এসে দেশের জন্য কিছু করো।' বাবু স্যারকে মুখের উপড় না করতে পারেনি। বলেছে দেখি স্যার কী করা যায়। বিষয়টি নিয়ে মনে মনে ভেবেছে অনেক। দেশে গিয়ে কী হবে ! গবেষণার আধুনিক ব্যবস্থা নেই, চাকরির নিরাপত্তা নেই, আরও কত কী ! শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরত আসার চিন্তা বাদ দিয়েছে। মনে একটা সান্ত্বনা তো চাই। এদেশে যদি ভালো কিছু করি তার সুফল পৃথিবীর সব মানুষই তো পাবে। বাংলাদেশও বাদ যাবে না। তাই তাঁর আর দেশে ফিরে আসা হলো না।

সাবিনা বেগম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আশরাফ চৌধুরীর দুই ব্যাচ পরে ভর্তি হয়েছে। একই সাবজেক্টে। বিবিএ। ইউনিভার্সিটির নবীনবরণের দিন সিনিয়র ব্যাচের সবাই পরিচিত হতে এলো। সাবিনাকে দেখে কেন যেন আশরাফের মনে মোচড় দিয়ে উঠলো। মেয়েটা তেমন ফর্সা নয়, আবার একনজরে চোখে পড়ার মতোও নয়। তবে ওর মুখে কি এক অপার সৌন্দর্য আর সারল্য লেপ্টে আছে ! আশরাফ চৌধুরীর বুকে কীসের যেন যন্ত্রণা শুরু হলো। একটি বুলেট যেন হৃৎপিণ্ডে কোথাও গিয়ে আটকে গেছে, অপারেশন করেও বের করা যাবে না। আশঙ্কা এই যে, অপারেশন করতে গেলে মৃত্যুও হতে পারে, এমন আশঙ্কা।

আশরাফ চৌধুরী আর সাবিনার সম্পর্ক দিনে দিনে গভীর হয়েছে, তবে গুলিয়ে যায়নি। সাবিনা মনে মনে ভাবে, আশরাফ বড়লোকের ছেলে আর আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ওদের সাথে আমাদের যাবে না। পাছে আশরাফ কী

ভাববে ! যদি ভাবে অনধিকার চর্চা, তাই এই কথাটি মুখ ফুটে কখনও বলেনি সাবিনা।

সাবিনা ও আশরাফ ক্লাসের ফাঁকে প্রায়ই অপরাজেয় বাংলার পায়ের কাছের দ্বিতীয় ধাপটিতে বসে গল্প করে। আজকে কিছুক্ষণ বসেই আশরাফ উঠে দাঁড়ালো। সাবিনাকে বললো, কিছু একটা নিয়ে খেতে খেতে গল্প করা যাবে, কি বলো ? কী খাবে তুমি ? 'কিছু একটা আনলেই হবে।' তবুও বলো। সাবিনা কোন কিছুর নাম বলে না। তুমি যা ভালো মনে করো তাই আনো। আশরাফ জানে যে সাবিনা ফুচ্‌কা পছন্দ করে। তুমি তো ফুচ্‌কা পছন্দ করো, তাহলে ফুচ্‌কা আনি, আর কি আনা যায়! হাকিম চত্বরে খাসীর কলিজা দিয়ে সিঙ্গারা বানায়। কয়েকটা গরম গরম নিয়ে আসি কি বলো ? 'তোমার যা ইচ্ছা নিয়ে এসো, সমস্যা নেই।' আশরাফ চলে গেলো ফুচ্‌কা আর সিঙ্গারা আনতে।

আশরাফ চলে যাওয়ার পর সাবিনা ভাবছে, আশরাফরা বড়লোক। সাবিনার বাবা সামান্য কেরানির চাকরি করেন। তার ওপর সততার সাথে আপোস করেন না। এ জন্য অনেক ভোগান্তি এবং ঝক্কি-ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে তার। একবার হয়েছিল কী, সাবিনার বাবা জামাল সাহেবের কাছে এক ব্যবসায়ীর ফাইল আটকা পড়েছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। জামাল সাহেব বলেছেন, আপনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেন, আমি ফাইলের রেকর্ড চেক করে ছেড়ে দেব। ঐ ব্যাবসায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে পারছেন না। কিছুদিন বিরতি দিয়ে একবার এলেন কিছু জাল কাগজপত্র নিয়ে। জালিয়াতির বিষয়টি জামাল সাহেবের কাছে অর্থাৎ সাবিনার বাবার কাছে ধরা পরে গেলো। ঐ ব্যবসায়ী জামাল সাহেবকে একটি প্যাকেটে টাকার একটি বান্ডেল ফাইলের মধ্যে গুঁজে দিলেন। ফাইল খুলে জামাল সাহেব টাকার প্যাকেট দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। তিনি ব্যবসায়ীর ফাইলটি ফেরত দিয়ে বললেন, মূল কাগজপত্র ছাড়া ফাইল ওপরে পাঠানো যাবে না।

ব্যবসায়ী চোখ রাঙিয়ে দাঁত কট্‌মট্‌ করে ফাইল নিয়ে বড় কর্তার কাছে গেলেন। বড়কর্তা জামাল সাহেবকে ইন্টারকমে ফোন দিয়ে বললেন, 'অমুক' সাহেবের ফাইল নিয়ে কী হয়েছে ? 'স্যার, এই ফাইলে অসুবিধা আছে।' কি অসুবিধা ? 'স্যার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। মূল কাগজ ছাড়া আমার পক্ষে ফাইল পাঠানো সম্ভব নয়।' বড় সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফোন ছেড়ে দিলেন। ব্যবসায়ী বড় সাহেবের কাছ থেকে ফেরত যাবার সময় জামাল সাহেবকে শাসিয়ে গেলেন। 'আমি আপনাকে দেখে নেব।' জামাল সাহেব কিছু একটা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেপে গেলেন।

ঘটনার কয়কদিন পর জামাল সাহেব রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন। তখন রাত নেমেছে। পথে একটি নির্জন জায়গায় অজ্ঞাত পরিচয় লোকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে জামাল সাহেবের উপড় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা পিটিয়ে জামাল সাহেবের মাথা ফাটিয়ে দেয়। ডান হাত দিয়ে লাঠি ঠেকাতে গিয়ে কনুইয়ের কাছে হাড় ভেঙ্গে যায়। চিৎকার-চেচামেচি শুনে আশে পাশের লোকজন জড়ো হলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এ নিয়ে জামাল সাহেবকে অনেক ভুগতে হয়েছে। সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সামাজিকভাবে তাকে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়েছে বহুবার। অফিসে আরও একজন জামাল ছিলেন। তিনি এই জামাল সাহেবের ঠিক উল্টো। সবাই তাকে 'সিস্টেম জামাল' নামে চেনে। আর সাবিনার বাবা 'ক্যাডা জামাল' নামে পরিচিত ছিলেন।

সততা আর দায়িত্বের সাথে আপোস করেন না বলে তার এই উপাধি। এখন তার অবসর জীবন। সামান্য অবসর ভাতা এবং সঞ্চয়পত্রের কিছু লাভ দিয়েই সংসার চলে। এই সাবিনার সাথে আশরাফ চৌধুরীর প্রেম এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন খুবই অবাস্তব মনে হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে তা এক প্রকার অসম্ভব। সাবিনা ভাবছে, কী করে সে কথাটা আশরাফকে বলবে। আশরাফ যে তাকে পাগলের মত ভালোবাসে।

একহাতে ফুচকার বাটি আর অন্যহাতে সিঙ্গারা নিয়ে এলো আশরাফ। ফুচ্‌কার প্লেটটা সাবিনার হাতে দিয়ে সিঙ্গারার প্যাকেট নিয়ে পাশে বসে পড়লো আশরাফ। একটা সিঙ্গারায় কামড় দিতে দিতে আশরাফ বলল, বাহ্ ! সিঙ্গারাটা তো মজার হয়েছে, আহ্ ! খুব গরম ! চুলার উপড় ছিল, দাঁড়িয়ে থেকে নিয়ে এলাম। গড়ম সিঙ্গারা তালুতে লেগে আশরাফ কেমন যেন তোতলা মত হয়ে কথা বলছিল। এতক্ষণ সাবিনা চুপ করে বসেছিল। সে দেখছিল আশরাফের উচ্ছ্বাস। এতক্ষণে আশরাফ খেয়াল করলো সাবিনা এখন পর্যন্ত একটা ফুচ্‌কাও খায়নি। আরে খাচ্ছো না যে ? খাও, খাও ! এখানকার ফুচ্‌কাটা খুবই মজার। আমি একটু টক্ বেশি করে দিতে বলেছি। তুমি খাবে তাই। তেঁতুলের টক্‌টা একটু বেশি ঘন করে বানালে তোমার খেতে ভালো লাগে তা আমি জানি। পেঁয়াজ, ধনেপাতাও ভালো করে ধুয়ে নতুন করে কাটিয়ে এনেছি। তারপরও সাবিনা খাচ্ছে না। কিন্তু এতক্ষণ আশরাফ তা খেয়াল করেনি। আরেকটা সিঙ্গারা খাওয়ার পর আশরাফ সাবিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। তার ডান হাতে বাকি আরেকটা সিঙ্গারা ধরা। মুখ কিছুটা হা করা অবস্থায় যেন ইলেক্ট্রিক শক্ খাওয়া মানুষের মত থেমে গেলো। কিছুটা ভয়ও পেলো সে। কয়েক মুহূর্ত পরে আশরাফ আস্তে করে বললো, কী হয়েছে সাবিনা ? কোনো কারণে তোমার মন খারাপ ? সাবিনা বলল, না এমনিতেই। এমনিতেই যে নয় তা আমার মত বোকা মানুষও বুঝতে পারে। তবে আমি ভাবছি তোমার শরীর খারাপ করেনি তো ! জ্বর টর হয়নি তো ? সাবিনার কপালে হাত দিতে গিয়েও কেনো যেনো আবার হাত ফিরিয়ে নিল আশরাফ। আশপাশের লোকেরা দেখলে কী ভাববে ? অথবা সাধারণ লজ্জাবোধ থেকেই হয়ত হাতটা ফিরিয়ে নিল। সাবিনা বললো, আমার কিছু হয়নি। তাহলে খাচ্ছো না যে ! সাবিনা তখন একটা ফুচ্‌কা প্লেট থেকে তুলে নিয়ে মুখ অল্প হা করে সামনের চারটা দাঁত দিয়ে আলতো করে ফুচ্‌কার কোনায় কামড় দিল। সাবিনার মন খারাপ দেখে আশরাফের সিঙ্গারা খাওয়ার গতিও কমে গেছে। গরম সিঙ্গারায় কামড় দেয়ার সেই উচ্ছ্বাস যেন মুহূর্তে হারিয়ে গেছে। খাসির কলিজার পুর দিয়ে বানানো গরম সিঙ্গারা এখন তার কাছে চরম বিস্বাদ ঠেক্‌ছে। ভর দুপুরের ক্ষিদে পেটে এখন যেন আর কোন ক্ষুধাই নেই। অনেক কষ্টে বাকি অর্ধেকটা সিঙ্গারা সে শেষ করলো। প্রথম অর্ধেকটা খেতে যে সময় লেগেছিল, দ্বিতীয় অর্ধেকটা খেতে তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি সময় নিলো। ইতোমধ্যে সাবিনা মাত্র দুটা ফুচ্‌কা খেয়েছে। আশরাফ মিনমিন করে বলল, আজকের সিঙ্গারাটা তত ভালো হয়নি। আর খেতে ইচ্ছে করছে না। বাকি তিনটা সিঙ্গারা টোকাইদের ডেকে দিয়ে দিলো। সাবিনা বললো, ফুচ্‌কায় এতো টক দিয়েছে যে মুখেই তুলতে পারছি না। থাক, না পারলে রাখো। এই পিচ্ছি, এই পিচ্ছি বলে একটি বাচ্চা টোকাই মেয়েকে ডেকে ফুচ্‌কার থালাটা দিয়ে দিলো। মেয়েটি খুব খুশি হয়ে নিয়ে গেলো। একটু দূরে গিয়ে আরও দুইজনের সাথে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিলো। ওদের খাওয়া দেখে মনে হলো ফুচ্‌কাটা খুবই মজা হয়েছে।

সাবিনার মুখ শুকনো দেখে আশরাফ কিছু বলবার ভাষা পাচ্ছিল না। তাই ফুচ্‌কার প্লেট হাতে মেয়েটিকে হাতের ইশারা করে ঘাড় ঝাকিয়ে নিজের দিকে আসতে ডাকলো। মেয়ে শিশুটি হয়তো আরও কিছু পাবার আশায় অথবা ইতিপূর্বে পাওয়া ফুচ্‌কার কৃতজ্ঞতায় এক দৌড়ে আশরাফের কাছে চলে এলো। তোমার নাম কি? 'কুলসুম।' থাকো কোথায় ? 'পলাশীর হেমুরায়।' তোমরা কয় ভাইবোন ? 'আমরা তিন বইন আর এক ভাই।' তুমি কি সবার ছোট ? 'না ! আমার ছোট আরও দুই বইন আছে।' তোমার বাবা মা আছে ? 'আছে।' বাবা কি কওে ? 'আগে কারান বাজারে রাইতে মাল টানতো, এহন আর করে না।' তাহলে কি কওে ? 'খালি হুইয়া থাহে।' সংসার চলে কিভাবে ? মানে খাওয়া দাওয়া কেমন করে চলে ? 'মায় মাইনশের বাড়িত কাম করে। ভাই গাড়িত বাদাম-বুট ব্যাচে। আমরা দুই বইনে কাগজ-মাগজ টুকাই।' এতে তোমাদের এতজন মানুষের সংসার চলে ? কুলসুম নিচের দিকে তাকিয়ে দুই হাতের নখ খুঁটছে। যেন এই শিশুটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটির সম্মুখীন হয়েছে। মেয়েটির সাথে আশরাফ এত কথা বলছে তা সাবিনার পছন্দ নয়। মাঝে মধ্যে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু বলছে না। আশরাফ শিশুটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সাবিনার দিকে তাকালো। এই সুযোগে মেয়েটি 'যাই স্যার' বলে এক দৌড়ে ওর ছোট বোনের কাছে চলে গেল। কোন্ কারণে সাবিনার মন খারাপ তা আশরাফ বুঝতে পেরেছ। কিন্তু ধরা দিলো না। আশরাফ একটু চটপটে স্বভাবের। মন ভারী করা একদম ভালো লাগে না তার। কেউ মন খারাপ করে থাকলে ওর ভীষণ কষ্ট হয়। আজও হচ্ছে। চলো সাবিনা চা বা কফি খেয়ে আসি। হাকিম চত্বরের ওখানে ভালো কফি পাওয়া যায়। চা ও খেতে পারো। তাহলে যেতে হবে পাবলিক লাইব্রেরির ভেতরের ক্যান্টিনে অথবা আরও একটু দূরে আজিজ মার্কেটের ওখানে।

সাবিনা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কোন কথা বললো না। সাবিনা মাথা একটু নিচু করে হাঁটছে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। মধুর ক্যান্টিনের কাছাকাছি এসে আশরাফ বললো, তুমিতো আবার এখানটায় আসতে খুব একটা পছন্দ করো না। আমি কিন্তু মাঝেমধ্য বন্ধু বান্ধবদের সাথে আসি। ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশ দিয়ে হাঁটছে। জানো আমাদের জাতীয় কবির জীবনটা স্বার্থক হয়েছে, সাবিনা আশরাফের কথা মন দিয়ে শুনতে মুখ তুলে আশরাফের দিকে তাকালো। আশরাফও সাবিনার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলো ধীরে ধীরে মান ভাংছে তার। ঐ গানটার কথা তোমার মনে নেই–'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই/যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'। সারা জীবনের কোন আশা পূরণ না হলেও মৃত্যুর পরে এই একটি আশা অন্তত তার পূরণ হয়েছে বলা যায়। এখন গোরে থেকেও প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার আজান শুনতে পান। কি ঠিক বলেছি না ? সাবিনা আবার মুখ তুলে আশরাফ-এর দিকে তাকালো।

জাতীয় কবির মাজার পেরিয়ে যাবার সময় সাবিনা বললো, 'চলো, পাবলিক্ লাইব্রেরির সিঁড়িতে গিয়ে বসি।' অনেকক্ষণ পর সাবিনার মুখে কথা ফুটেছে দেখে আশরাফের আনন্দের সীমা নেই। ও এখন দ্রুতই পা চালাচ্ছিল। কখনো সাবিনাকে ছাড়িয়ে সামনে চলে যাচ্ছিল। আবার তাকে সঙ্গ দেবার জন্য দাঁড়িয়ে একসাথে হাঁটছে। আশরাফের মন চাইছে কত তাড়াতড়ি ওখানে গিয়ে বসবে।